১০

দ্বিতীয় বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা
ডিসেম্বর ৮৯-জানুয়ারী '৯০

স্বাস্থ্য ও পরিবেশ

সূচীপত্র

স্বাস্থ্য ও পরিবেশ

চিত্তরঞ্জন ঘোষ	●	সম্পাদকীয় ঃ জল-সম্পদ সংরক্ষণ	১২৫
রণবীর মুখোপাধ্যায়	●	চোখের রোগ ঃ সমস্যা ও প্রতিকার ট্যারা চোখ	১২৭
বিজয় মুখার্জী	●	স্ত্রী-শিক্ষা ও শিশুস্বাস্থ্য	১২৯
সুনীল সেনশর্মা	●	প্রতিটি গ্রামীণ মানুষের জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জল	১৩৩
তপোব্রত সান্যাল	●	পরিবেশ/আমাদের দায়-দায়িত্ব	১৩৯
পুণ্যব্রত গুণ	●	'থায়োসালফেটের লড়াই'/নেপথ্যে ভুপাল	১৪৫
সুরজিৎ জানা	●	কম্পিউটার শিক্ষা ও পেশাগত রোগ	১৪৯
পূর্ণ কর	●	জন্ম-মৃত্যু পঞ্জীকরণের গুরুত্ব	১৫৩
ডাঃ অসিত কুমার দত্ত	●	ওষুধের অপব্যবহার	১৫৫
অসীমকুমার সরকার	●	রক্তের সম্বন্ধে জানবার কথা	১৫৯

রেজিস্ট্রেশন নং ৪৮০৭৬/৮৮

ফর্ম—৪

পত্রিকার নাম—স্বাস্থ্য ও পরিবেশ।

প্রকাশকাল ও স্থান—দ্বিমাসিক। কলকাতা।

প্রকাশক ও মুদ্রক—পশুপতিনাথ চট্টোপাধ্যায়। ভারতীয় নাগরিক। সিডি ৩২৭, সল্টলেক। কলিকাতা-৬৪।

সম্পাদক—পশুপতিনাথ চট্টোপাধ্যায়। ভারতীয় নাগরিক। সিডি ৩২৭, সল্টলেক। কলিকাতা-৬৪।

স্বত্বাধিকারী—পশুপতিনাথ চট্টোপাধ্যায়। ভারতীয় নাগরিক। সিডি ৩২৭, সল্টলেক। কলিকাতা-৬৪।

'থায়োসালফেটের লড়াই' / নেপথ্যে ভূপাল

স্বাস্থ্য ও পরিবেশ

পুণ্যব্রত গুণ

আজ যা ঘটনা, কাল তা ইতিহাস হয়। কিন্তু ইতিহাস হওয়ারও ইতিহাস আছে। সে ইতিহাস হল, প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ, প্রামাণ্য দলিল-দস্তাবেজ। ভূপাল আজ অনেকটাই ইতিহাস, পৃথিবীর ইতিহাসে মর্মান্তিক এক অধ্যায়। তবু তার নেপথ্যে অনেক ঘটনা, অনেক শঠতা, অনেক প্রবঞ্চনা, অনেক লড়াই—এখনো অনুদ্‌ঘাটিত, জনসাধারণের অজানা। ভবিষ্যতে 'অয়ি ইতিবৃত্তকথা, ক্ষান্ত করো মুখর ভাষণ, ওগো মিথ্যাময়ী'—এই উধৃতির সমান্তরালে, ভূপালের নেপথ্যের অজানা বা স্বল্প-জানা এক লড়াই নিয়ে এ নিবন্ধ। এ লড়াইয়ের নাম **'থায়োসালফেটের লড়াই'**—আর সে লড়াইয়ে আমি প্রত্যক্ষদর্শীই মাত্র ছিলাম না, ছিলাম এক প্রত্যক্ষ সৈনিকও।

থায়োসালফেট অর্থাৎ সোডিয়াম থায়োসালফেট সায়ানাইড বিষক্রিয়ার অ্যান্টিডোট। ১৯৮৪-র ২রা ডিসেম্বর, ভূপালে ইউনিয়ন কার্বাইড কারখানার থেকে যখন বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল বিষ-গ্যাসের ধোঁয়া, তারপর থেকে অনেকদিন থায়োসালফেট নিয়ে জল ঘোলা হয়েছে।

ভূপালের মেডিক্যাল কলেজ, গান্ধী মেডিকেল কলেজের ফরেন্‌সিক বিভাগের প্রধান ডাঃ হীরেন চন্দ্র ৩রা ডিসেম্বরই গ্যাসকাণ্ডে মৃত ব্যক্তিদের শব ব্যবচ্ছেদ করে সিদ্ধান্তে আসেন যে, সায়ানাইড বিষ আছে গ্যাস আক্রান্তদের শরীরে। **তিনি তখনই সুপারিশ করেছিলেন—জীবিত গ্যাস আক্রান্তদের থায়োসালফেট ইঞ্জেকশন দেওয়া হোক্‌।**

৪ঠা ডিসেম্বর, ইউনিয়ন কার্বাইড কর্পোরেশনের ওয়েস্ট-ভার্জিনিয়াস্থিত কারখানার চীফ মেডিক্যাল অফিসার এক **টেলেক্স বার্তায় সোডিয়াম থায়োসালফেটকে বিষ গ্যাসের প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহার করতে বলেন।** (পরে অবশ্য তিনি বলেন যে, এ নির্দেশ তিনি ঘুমের ঘোরে দিয়েছিলেন!)

৬ই ডিসেম্বর, সেণ্ট্রাল পলিউশন কণ্ট্রোল বোর্ড কারখানায় এক পরীক্ষা চালান। যে ট্যাংকটি থেকে বিষ গ্যাস লিক্‌ করেছিল তার ৫০ মিটার ব্যাসার্ধের মধ্যেকার বাতাসে অস্বাভাবিক মাত্রায় সায়ানাইডের উপস্থিতি পাওয়া যায়।

৮ই ডিসেম্বর, খ্যাতনামা জার্মান বিষবিদ্‌ (toxicologist) ম্যাক্স ডন্‌ডেরার ভূপালে আসেন। **তাঁর রায় ছিল গ্যাস পীড়িতদের থায়োসালফেট দেওয়া হোক্‌। সে সময় ভারতে থায়োসালফেট তৈরী হত না, তাই তিনি সঙ্গে আনা দশ হাজার থায়োসালফেটের অ্যাম্পুল রেখে গেলেন গ্যাস পীড়িতদের জন্য।**

কিন্তু যদি থায়োসালফেট দিয়ে গ্যাস পীড়িতদের অবস্থায় উন্নতি হয়, তার মানে দাঁড়ায়—বিষ-গ্যাস মিশ্রণে সায়ানাইডের উপস্থিতি প্রমাণিত হয়ে যাবে। এতে করে ইউনিয়ন কার্বাইডের Criminal responsibility অনেক গুণ বেড়ে যেত, অনেক বেশী ক্ষতিপূরণ দিতে তাদের বাধ্য করা যেত।

ইউনিয়ন কার্বাইডের দায়ভার লঘু করতে তাই সক্রিয় হয়ে উঠল সরকারী স্বাস্থ্য দপ্তরে কার্বাইডের দোসররা। ১৩ ডিসেম্বর, প্রধান স্বাস্থ্য অধিকারী **ডাঃ এম. এন. নাগ** সরকারী ডাক্তারদের নির্দেশ দিলেন—যতদিন না রাসায়নিক বিশ্লেষণে প্রমাণিত হচ্ছে রক্তে সায়ানাইড আছে, ততদিন অবধি **সোডিয়াম থায়োসালফেট ব্যবহার করা যাবে না।**

শুরু হল ভূপালে জনস্বাস্থ্যের লড়াই—**থায়োসালফেটের লড়াই**। এ লড়াইয়ে গ্যাস পীড়িতদের মদত দিয়েছিলেন ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (I.C.M.R.), জহরিলী গ্যাস-কাণ্ড সংঘর্ষ মোর্চা (Z.G.K.S.M.), সমাজ সচেতন চিকিৎসাজীবীদের দু'টি সংগঠন মেডিক্যাল ফ্রেন্ডস্‌' সার্কেল (M.F.C.) আর পশ্চিমবঙ্গ ড্রাগ এ্যকশন ফোরাম (W.B.D.A.F.)।

জানুয়ারী, '৮৫তে I.C.M.R. থায়োসালফেটের কার্যকারিতার উপর একটি বৈজ্ঞানিক আলোচনাচক্র করেন। ১৪ই ফেব্রুয়ারী I.C.M.R. একটি সভায় সুপারিশ করেন,

এমন সমস্ত মানুষকে থায়োসালফেটের ইঞ্জেকশন দেওয়া হোক—

(ক) যাঁরা গ্যাস কাণ্ডের পর থেকে শ্বাসতন্ত্র, পরিপাকতন্ত্র বা স্নায়ু-মাংস পেশীতন্ত্রের উপসর্গে ভুগছেন ;

(খ) গ্যাস কাণ্ডের পরবর্তী আশু উপসর্গগুলি থেকে সাময়িক মুক্তি পাওয়ার পরেও যাঁদের উপসর্গগুলির পুনরাবির্ভাব হয়েছে ;

(গ) যাঁরা গ্যাসকাণ্ডের পরে পরেই পালমোনারী ইডিমা বা কোমায় আক্রান্ত হয়েছিলেন ;

(ঘ) যাঁদের পরিবারে গ্যাসজনিত মৃত্যু হয়েছে অথবা যাঁরা গ্যাসকাণ্ডের সময়কার হাওয়ার গতির দিকে কার্বাইড কারখানার দু কিলোমিটারের মধ্যে বাস করেন।

সুপারিশে বলা হয় ইঞ্জেকশন দেওয়ার আগে এবং পরে রোগীর প্রস্রাবের থায়োসায়ানেটের মাত্রা মেপে নথিভুক্ত করার জন্য। **এ কাজ করা হলে কার্বাইডের বিরুদ্ধে ক্ষতি-পূরণের মামলায় গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক দলিল পাওয়া যেত। তাই স্বাস্থ্যবিভাগে কার্বাইডের দালালরা এ সুপারিশকে অগ্রাহ্য করলেন।**

সরকারী নিষ্ক্রিয়তার এ বিপদে এগিয়ে এল স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি। M.F.C.-র সদস্য ১২ জন চিকিৎসক একটি সার্ভের পর জনসমক্ষে এক দাবী পত্র হাজির করলেন। দাবীগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল—

(ক) I.C.M.R.-এর সুপারিশ অনুযায়ী থায়ো-সালফেট দিয়ে গ্যাসপীড়িতদের চিকিৎসার দাবী।

(খ) গ্যাসের প্রকৃতি এবং গ্যাস সংক্রান্ত রোগীদের বিষয়ে সমস্ত তথ্য গ্যাস-আক্রান্তদের জানানোর দাবী।

৮ই মার্চ, ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের ভুপাল শাখার একটি মিটিং ছিল। সভাস্থলে গ্যাসপীড়িত মহিলারা উপস্থিত চিকিৎসকদের কাছে দাবী করলেন—থায়োসালফেট দিয়ে বিষমুক্তির কাজ ত্বরান্বিত করা হোক।

মার্চ মাসে বোম্বের K.E.M. হাসপাতালের চিকিৎসক ও কারিগরীবিদ্‌রা এবং M.F.C., দুটি ব্যাপক সার্ভে করেন গ্যাস পীড়িতদের স্বাস্থ্য সমস্যার ওপর। সার্ভের রিপোর্ট দুটি গ্যাস আক্রান্তদের প্রকৃত অবস্থা হাজির করল লোকচক্ষের সামনে।

৪ঠা এপ্রিল I.C.M.R. একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আবার ১৪ই ফেব্রুয়ারীর সুপারিশের পুনরাবৃত্তি করলেন।

সরকার নড়াচড়া করতে বাধ্য হল। কেন্দ্রীয় সরকারের ভেষজ কারখানা I.D.P.L. থেকে থায়োসালফেট তৈরী হয়ে এল। নামু কা ওয়াস্তে সরকারী হাসপাতালগুলিতে থায়োসালফেট দেওয়া হতে থাকল খুব ধীরগতিতে। **অথচ প্রয়োজন ছিল একটি সময়বদ্ধ (time bound) যোজনার।**

গ্যাসপীড়িতরা থায়োসালফেটের দাবীতে এবার কড়া কদম ফেললেন। ইউনিয়ন কার্বাইড কারখানার প্রাঙ্গণে এক টুকরো জায়গা দখল করে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হল —'গণ হাসপাতালে'র,—৩রা জুন। 'জন স্বাস্থ্য কেন্দ্র' চালু হোল, যেখানে গ্যাস পীড়িতদের থায়োসালফেট ইঞ্জেকশন দেওয়া হত।

জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিচালনার জন্য 'জনস্বাস্থ্য সমিতি' গড়া হল চারটি সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে—জহরিলী গ্যাস কাণ্ড সংঘর্ষ মোর্চা (Z.G.K.S.M.), নাগরিক রাহত আউর পুনর্বাস কমিটি (N.R.P.C.), ট্রেড ইউনিয়ন রিলিফ ফাণ্ড (T.U.R.F.) আর ইউনিয়ন কার্বাইড কর্মচারী সংঘ (U.C.K.S.)। **জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসকরা ছিলেন মূলত কলকাতা থেকে আসা ইন্টার্ণি।** ইণ্টার্নশিপের কাজ থেকে ছুটি নিয়ে গ্রুপে গ্রুপে এঁরা আসতে লাগলেন রিলে করে। স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অন্যান্য কাজ করতেন অন্যান্য বিজ্ঞানকর্মীরা আর বস্তিবাসীরা।

দিনে প্রায় দেড়শজনকে ইঞ্জেকশন দেওয়া হ'ত জন-স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রকে কেন্দ্র করে গ্যাসপীড়িত মানুষ সংগঠিত হতে থাকেন। সরকার ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। স্বাস্থ্য কার্যক্রম থেকে গ্যাস পীড়িত মানুষদের সরিয়ে নিতে চরম অনৈতিক কাজ করে তারা। থায়ো-সালফেট সরকারী হাসপাতাল থেকে সরবরাহ হত। **একটি সরবরাহে ইঞ্জেকশনের একটি অশুদ্ধ ব্যাচ ঢুকিয়ে**

দেওয়া হয় ১৫ই জুন, যাতে করে ইঞ্জেকশন দেওয়ার পর রি-অ্যাকশন হয় এবং গ্যাসপীড়িতরা ভয় পেয়ে ইঞ্জেকশন নেওয়া বন্ধ করেন। বলা বাহুল্য, জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্মীরা সরকারের এ অপপ্রয়াসকে বানচাল করে দেন।

৩রা জুন থেকে ২৪শে জুন, জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রে মোট ৯২ জন চিকিৎসিত হন। গ্যাস পীড়িতদের ভীড় বেড়ে চলে।

২৪শে জুন রাতে, সরকার স্বমূর্তি ধারণ করল। হত্যাকারী কার্বাইডের ওপর কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি, অথচ দমনমূলক ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হ'ল জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্মীদের ওপর। শহরের বিভিন্ন কোণ থেকে গ্রেপ্তার করা হল, ডাক্তার সহ ৩১ জন কর্মীকে। বাজেয়াপ্ত করা হল জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রের সমস্ত চিকিৎসা সংক্রান্ত নথিপত্র। জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রে পুলিশী পাহারা বসানো হ'ল। স্বাস্থ্য বিভাগ, থায়োসালফেটের সরবরাহ বন্ধ করে দিল এই অজুহাতে যে, জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রের পরিবেশ খুব অপরিচ্ছন্ন, অস্বাস্থ্যকর।

এই পর্যায়েই ভুপালের সঙ্গে আমার যোগাযোগ। গ্যাস-কাণ্ড যখন ঘটে তখন আমি মেডিক্যাল কলেজে হাউসস্টাফ-শিপ করছি। সত্যি কথা বলতে ভুপাল-কাণ্ড বা ভুপাল নিয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবেশ আন্দোলন আমার মনে সে সময় খুব একটা দাগ কাটেনি। আন্দোলন বলতে তখন আমি বুঝতাম কেবলই রাজনৈতিক আন্দোলন, ভাবতাম প্রশিক্ষণ শেষে কোন একটি রাজনৈতিক ধারার সাথে একাত্ম হব, পাশাপাশি সংগঠনের স্বার্থে কিছুটা ডাক্তারী করব। স্বাস্থ্য আন্দোলনের স্বরূপ সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই ছিল না। ভুপালে গিয়ে আমার চোখ খুলে যায়।

ভুপালে যাওয়ার সিদ্ধান্তটা আমি নিই হঠাৎ করে। ২৫ জুনের পুলিশী দমনের পর জুনিয়ার ডাক্তাররা সাময়িকভাবে হতোদ্যম হয়ে পড়েছিলেন। নতুন করে ডাক্তারের টীম পাঠানো যাচ্ছিল না। সে সময়ে কলকাতায় জুনিয়ার ডাক্তারদের সংগঠিত করে ভুপালে পাঠানোর দায়িত্বে ছিল আমার জুনিয়র বন্ধু জ্যোতি। জ্যোতির কাছে ব্যাপারটা শুনে আমি ঠিক করলাম ভুপালে যাব, দেখাই যাক না পুলিশ কি করে। জ্যোতি আর আমি ভুপাল গিয়ে পৌঁছই ২রা জুলাই।

ভুপালে আমরা ZGKSM-এর অফিসে গিয়ে উঠলাম। এর মধ্যে ডাক্তাররা ছাড়া পেয়ে গিয়েছিলেন, একজন ছাড়া বাকী সবাই নিজের নিজের কর্মস্থলে ফিরেও গেছেন। জন-স্বাস্থ্য কেন্দ্র বন্ধ। ভুপালের বাইরের ভুপাল-কর্মীরা আবার ধীরে ধীরে জড়ো হচ্ছেন ভুপালে। জ্যোতি আগে ভুপালে মাসদুয়েক কাজ করে গেছে, ও খুব তাড়াতাড়ি কাজে লেগে গেল। প্রথম বার আমার খুব একটা ভাল লাগেনি ভুপালে, পরিচিতি নেই, হিন্দী ভাল বলতে পারি না। ৭টা দিন ZGK M-এর অফিসে paper clipping-এর file, ভুপাল বিষয়ক বিভিন্ন লেখা-পত্র পড়ে কাটালাম। আর দেখলাম কী উদ্দীপনা, কী দৃঢ়সংকল্পের সাথে ভুপাল নিয়ে কিছু বিজ্ঞানকর্মী কাজ করে যাচ্ছেন। নিজের এতদিনের নিষ্ক্রিয়তার জন্য অনুতাপ হতে লাগল।

তখনও আমার হাউসস্টাফশিপের টার্ম শেষ হতে মাস-দেড়েক বাকী। কলকাতা ফিরে যেতে হবে, লম্বা সময় ধরে কিছুটা কাজের কাজ করতে হবে।

জুলাই মাসে জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রের তৎকালীন মুখ্য চিকিৎসক ডাঃ নিশীথ ভোরা আর দুজন গ্যাসপীড়িত—সুপ্রীম কোর্টে সরকারের বিরুদ্ধে একটি অভিনব মামলা দায়ের করেন। এঁরা দাবী জানান, 'গ্যাস আক্রান্তদের চিকিৎসা বন্ধ করা চলবে না', জনস্বাস্থ্যকেন্দ্র চালাতে দিতে হবে', 'নিয়মিতভাবে সোডিয়াম থায়োসালফেট সরবরাহ করতে হবে'।

'৮৪-র ২১শে আগস্ট আমি ভুপালে দ্বিতীয়বার গিয়ে পৌঁছই। এবার আর হাউসস্টাফশিপের টান নেই। আমার সঙ্গে ছিল এক জুনিয়র বন্ধু, ও গিয়েছিল দিন দশেকের জন্য। আমরা পৌঁছানোর কয়েকদিন পরে পুণা থেকে M.F.C.-র ডাঃ অনন্ত ফাদকে এলেন, মাসখানেক কাজ করার জন্য। তখনও থায়োসালফেটের সরবরাহ নেই, জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র বন্ধ।

২৫শে আগস্ট নতুন করে জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কাজ শুরু করা হল। আসল ওষুধ, অর্থাৎ থায়োসালফেট হাতে নেই। আমাদের কাজ হল গ্যাস পীড়িতদের উপসর্গগুলিকে

লিপিবদ্ধ করা। সে সময়কার প্রধান উপসর্গগুলো ছিল—সামান্য পরিশ্রমে শ্বাসকষ্ট, ক্ষিধে কমে যাওয়া, পেট ভারী ভারী লাগা, পেটের উপরভাগে ব্যথা, দৌর্বল্য, অবসাদ, ঘুমের ব্যাঘাত ইত্যাদি। রোগীদের সঙ্গে কথা বলে আমরা সরকারী চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্বন্ধে ধারণা করার চেষ্টা করতাম। সবারই এক অভিযোগ,—**সরকারী হাসপাতালে লম্বা লাইন পড়ে, স্বজনপোষণ চলে, বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ওষুধ পাওয়া যায় না, সরকারী ডাক্তাররা যত্ন নিয়ে চিকিৎসা করেন না।**

২৮শে আগস্ট **সুপ্রীম কোর্টের এক অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ বেরোয়—সরকারকে জনস্বাস্থ্যকেন্দ্রে সোডিয়াম থায়োসালফেট সরবরাহ করতে বলা হয়।** তবে একটা শর্ত—স্থায়ী রেজিস্ট্রেশন আছে এমন কোন ডাক্তারই সরবরাহ নিতে পারবেন।

ডাক্তারী পাশ করার পর রাজ্যের মেডিক্যাল কাউন্সিলে আবেদন করলে এক বছরের অস্থায়ী রেজিস্ট্রেশন মেলে। এক বছরের ইন্টার্নসিপের পর স্থায়ী রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করতে হয়। হাউসস্টাফসিপে স্থায়ী রেজিস্ট্রেশন নম্বরের খুব একটা প্রয়োজন হয় না। তাই করছি—করব করতে করতে আমি স্থায়ী রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করিনি। করেছিলাম কলকাতা ছাড়ার ঠিক আগে। নম্বর পেতে কমসে কম দুমাস লাগবে। তাই আমার পক্ষে সরকারী হাসপাতাল থেকে সরবরাহ নেওয়া সম্ভব ছিল না।

ঠিক হল ডাঃ অনন্ত ফাদকে ইনজেকশন সরবরাহ নেবেন, ওঁর ছত্রছায়ায় আমি থায়োসালফেট ক্লিনিক চালাব। ৯ই সেপ্টেম্বর থায়োসালফেট ক্লিনিক শুরু হল।

জনস্বাস্থ্য সমিতির অন্তর্গত চারটি সংগঠনের মধ্যে তখন কেবল তিনটি সক্রিয়—Z.G.K.S.M., N.R.P.C. আর T.U.R.F.। তিনটি সংগঠন, দু'জন করে স্বেচ্ছাসেবক দিলেন ক্লিনিক চালানোর জন্য। প্রথম বারের মত স্বতঃস্ফূর্ততা নয়, এবার systematically কাজ শুরু করা হল। প্রতি সপ্তাহে আমরা ৫০ জন রোগীর চিকিৎসা করতাম সপ্তাহের সোমবার থেকে শনিবার অবধি ছয় দিন। প্রথম দিন রোগীদের বাছাই, জিজ্ঞাসাবাদ, শারীরিক পরীক্ষা আর প্রস্রাব পরীক্ষা হত। প্রতিদিন শিরায় একটি ইঞ্জেকশন দেওয়া হ'ত—মোট ছয়দিন। তৃতীয় এবং ষষ্ঠ ইঞ্জেকশনের পর পরীক্ষা করে দেখা হ'ত রোগী কতটা লাভবান হয়েছেন। শারীরিক পরীক্ষা আর ইঞ্জেকশন দেওয়া ছাড়া বাকী সব কাজই করতেন স্বেচ্ছাসেবকরা। ৭ই অক্টোবর অবধি কাজ চলে।

আমরা যখন থায়োসালফেট দেওয়ার কাজ করছি, ডাঃ ফাদকে সে সময় করছিলেন আরো গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ, জনশিক্ষামূলক দুটি পুস্তক লেখার কাজ। প্রথমটি 'ভোপালমে* থায়োসালফেট কী লড়াই' নামে, প্রথমটি প্রকাশিত হয় '৮৫র ডিসেম্বরে। দ্বিতীয়টি 'হমারী সেহত হমারী লড়াই' নামে '৮৬র প্রথমে প্রকাশ করে M.F.C. এবং গণবিজ্ঞান সংস্থা 'একলব্য'। ডাঃ ফাদকে ভুপাল ছাড়ার পর, M.F.C.র ডাঃ সঞ্জীব কুলকার্ণি দায়িত্ব নিলেন থায়োসালফেটের।

জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রের থায়োসালফেট চিকিৎসায় প্রমাণিত হচ্ছিল—গ্যাসকাণ্ডের ন-দশ মাস পরেও থায়োসালফেটের কার্যকারিতা আছে। আবার গ্যাসপীড়িতরা সংগঠিত হচ্ছেন। সরকার সক্রিয় হয়ে উঠল জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রের বিরুদ্ধে—ডাক্তার ও কর্মীদের পিছনে পুলিশী গোয়েন্দা লাগিয়ে ভয় দেখানোর চেষ্টা করা হল, সরবরাহীকৃত ইঞ্জেকশনের মধ্যে অশুদ্ধ হিসাবে প্রমাণিত ব্যাচের ইঞ্জেকশন ঢুকিয়ে রিঅ্যাকশন ঘটিয়ে গ্যাসপীড়িতদের মধ্যে ভীতির উদ্রেক করার চেষ্টা হল।

এসব যখন বিফলে গেল তখন সরকার দোসর খুঁজে পেল জনস্বাস্থ্য সমিতির অন্তর্ভুক্ত একটি সংগঠনকে। ক্লিনিকের স্থান নিয়ে ঝঞ্ঝাট পাকিয়ে এরা ক্লিনিক বন্ধ করে করল। ডাক্তারদের নামে চুরির অভিযোগে, মিথ্যা কেস দায়ের করল। ভাড়াটে গুণ্ডাদের দিয়ে ডাক্তারদের ভয় দেখানো হতে লাগল।

কিন্তু জনমুখী উদ্যোগকে দাবিয়ে রাখা যায়নি। মেডিকো ফ্রেন্ডস-ড্রাগ অ্যাকশন ফোরামের সহায়তায় 'জহরিলী গ্যাস কাণ্ড সংঘর্ষ মোর্চার' উদ্যোগে নতুন স্বাস্থ্য কেন্দ্র, নতুন ক্লিনিক চালু হয় '৮৫র ২১শে অক্টোবর গ্যাস আক্রান্ত জনবসতি কাঁইচি-ছোলায়। ভুপালের মানুষ প্রভুত অর্থদান করেন ক্লিনিকটি চালানোর জন্য। আইনী মার-

প্যাঁচ এড়াতে নতুন স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির নাম রাখা হয় 'জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র (ভুপাল)'। এতদিনে কলকাতা থেকে আমার স্থায়ী রেজিস্ট্রেশন এসে গেছে, ১৫ নভেম্বর অবধি আমি মুখ্য চিকিৎসক হিসাবে কাজ চালাই। আমার পরে কেন্দ্রের মুখ্য চিকিৎসক ছিলেন যথাক্রমে শহীদ হাসপাতালের ডাঃ শৈবাল জানা ও ডাঃ চঞ্চলা সমাজদার।

থায়োসালফেট চিকিৎসার পাশাপাশি কতগুলি নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করা হয় এ কেন্দ্রে। তিনটি ইঞ্জেকশনের কোর্স নিয়ে পরীক্ষা করা হয়। প্রতি সপ্তাহে চিকিৎসার ফলাফল বিশ্লেষণ করে ভুপাল নিয়ে কার্যরত স্বাস্থ্য সংগঠনগুলিকে পাঠানো হতে থাকে। সপ্তাহে তিনদিন শিশুদের জন্য বিশেষ ক্লিনিক চালানো হয়। জনশিক্ষামূলক দুটি পোস্টার প্রদর্শনী গড়ে তোলা হয়—গ্যাসপীড়িতদের চোখের সমস্যা এবং গ্যাসপীড়িত শিশুদের স্বাস্থ্য সমস্যার ওপর। '৮৬র প্রথম অবধি জনস্বাস্থ্যকেন্দ্র (ভুপাল) চলেছিল। পরে চিকিৎসকের অভাবে কেন্দ্রটি কার্যত বন্ধ হয়ে যায়।

খুবই স্বল্পায়ু কার্যক্রম ছিল জনস্বাস্থ্যকেন্দ্র। কিন্তু জনস্বাস্থ্যকেন্দ্রের আসল রূপ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নয়, এটি লড়াই-এর একটি প্রতীক। সুচিকিৎসার দাবীতে, গ্যাস-সংক্রান্ত সমস্ত সত্য তথ্য প্রকাশের দাবীতে গ্যাস পীড়িতদের লড়াই-এর প্রতীক।

জনস্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তার নিশীথ ভোরা ও দুজন গ্যাস-পীড়িত সুপ্রীমকোর্টে যে মামলা দায়ের করেছিলেন, তাতে '৮৫র ৪ঠা নভেম্বর বিচারপতি এক অভিনব রায় দেন। সাত সদস্যের উচ্চ ক্ষমতাশীল একটি কমিটি গড়া হয়—যাঁদের কাজ গ্যাসপীড়িতদের দ্রুত চিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির ব্যাপারে নজরদারী। যেসব তথ্য এতদিন গোপন করে রেখেছিল সরকার, সেগুলি এই কমিটিকে জানাতে বাধ্য হয় সে। বিচারপতির নির্দেশে এই কমিটির সদস্য হন ZQKSM-এর বিজ্ঞানী কর্মী ডঃ অনিল সদগোপাল আর D.A.F-এর নেতা ডাঃ সুজিত দাশ।

প্রায় এক বছর কমিটির কাজ চলার পর কমিটি বাস্তবত দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়—পাঁচজন সরকারী বিশেষজ্ঞ নিয়ে সংখ্যাগুরু অংশ, আর দু'জন বেসরকারী বিশেষজ্ঞ ডাঃ সদ্‌গোপাল ও ডাঃ দান্য নিয়ে সংখ্যালঘু অংশ। সংখ্যাগুরু অংশ দেড় পাতার একটি রিপোর্টে সরকারী কাজকর্মকে সঠিক বলে রায় দেন। সংখ্যালঘু অংশ পর পর তিনটি রিপোর্ট (৫০০ পাতার) পেশ করেন। এই রিপোর্টগুলিতে নথিভুক্ত হয় চিকিৎসা বিষয়ে সরকারী অবহেলা, ইউনিয়ন কার্বাইডের শঠতা, ভারতের উচ্চ গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির অকর্মণ্যতা। বিষগ্যাস, গ্যাস আক্রান্তদের শরীরে যে স্থায়ী বিষক্রিয়া সৃষ্টি করেছে তার তথ্য প্রমাণ হাজির করা হয়। গ্যাস পীড়িতদের সুদূরপ্রসারী ক্ষতি (ক্যান্সার, বংশাণুজনিত রোগ ইত্যাদির) সম্বন্ধে সর্তকতা উচ্চারিত হয়। সুপারিশ করা হয় চিকিৎসা, গবেষণা ও পুনর্বাসনের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য একটি জাতীয় চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কমিশন গঠনের।

গ্যাস কাণ্ডের সাড়ে চার বছর পর যখন সুপ্রীম কোর্টের সমর্থনে ভারত সরকার ও ইউনিয়ন কার্বাইড যখন এক অন্যায় সমঝোতায় এসেছে গ্যাসপীড়িতদের ক্ষতিপূর্তির বিষয়ে, তখন সংখ্যালঘু রিপোর্টকে কেন্দ্র করে আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে কালা সমঝোতার বিরুদ্ধে। গ্যাসপীড়িতরা নতুন করে সংঘবদ্ধ হয়েছেন 'ভুপাল গ্যাস-পীড়িত মহিলা উদ্যোগ সংগঠন'-এর নেতৃত্বে। ভুপালের বাইরেও যে ভুপাল আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসছিল, তাতে নতুন প্রাণের জোয়ার এসেছে।

ভুপালের জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র আজ মৃত, দীর্ঘজীবী হোক ভুপালের জনস্বাস্থ্য আন্দোলন।